ফ্যামিলি গাইড বই

মানসিক রোগ ও মাদকাসক্তি

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মেন্টাল হেলথ
ঢাকা, বাংলাদেশ

NCDC
Directorate General of Health Services

World Health Organization
Country Office for Bangladesh

ফ্যামিলি গাইড বই

মানসিক রোগ ও মাদকাসক্তি

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মেন্টাল হেলথ
ঢাকা, বাংলাদেশ

NCDC
Directorate General of Health Services

World Health Organization
Country Office for Bangladesh

National Institute of Mental Health, Dhaka, Bangladesh
Family Guide Book on Mental Health and Drug Addict

ISBN: 978-984-33-9150-6

© World Health Organization 2015

Printed in Dhaka, Bangladesh
December 2015

Suggested citation:

National Institute of Mental Health, Ministry of Health and Family Welfare, World Health Organization. Family Guide Book on Mental Health and Drug Addict. Third edition. World Health Organization. Dhaka, 2015.

সম্পাদনা কমিটি

সভাপতি

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আব্দুল হামিদ
পরিচালক ও অধ্যাপক, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট (এনআইএমএইচ), ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ এনায়েত হোসেন
লাইন ডাইরেক্টর, এনসিডিসি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

অধ্যাপক ডাঃ এম. মোস্তফা জামান
ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার (এনসিডি), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ঢাকা

মোঃ মনিরুজ্জামান
ন্যাশনাল কনসালটেন্ট, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ঢাকা

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ ফারুক আলম
অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, চাইল্ড এডোলেসেন্ট অ্যান্ড ফ্যামিলি সাইকিয়াট্রি বিভাগ, এনআইএমএইচ, ঢাকা

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আব্দুল মোহিত (মোহিত কামাল)
অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, সাইকোথেরাপী বিভাগ, এনআইএমএইচ, ঢাকা

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ তাজুল ইসলাম
অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, কমিউনিটি অ্যান্ড সোসাল সাইকিয়াট্রি বিভাগ, এনআইএমএইচ, ঢাকা

অধ্যাপক ডাঃ নিলুফার আখতার জাহান
অধ্যাপক, জেরিয়াট্রিক অ্যান্ড অর্গানিক সাইকিয়াট্রি বিভাগ, এনআইএমএইচ, ঢাকা

ডাঃ মহাদেব চন্দ্র মন্ডল
সহযোগী অধ্যাপক, এডাল্ট সাইকিয়াট্রি বিভাগ, এনআইএমএইচ, ঢাকা

ডাঃ মোহাম্মদ খসরু পারভেজ চৌধুরী
সহযোগী অধ্যাপক, ফরেনসিক সাইকিয়াট্রি বিভাগ, এনআইএমএইচ, ঢাকা

ডাঃ মোঃ ফখরুজ্জামান শহীদ
সহকারী অধ্যাপক, ফরেনসিক সাইকিয়াট্রি বিভাগ, এনআইএমএইচ, ঢাকা

ডাঃ মোঃ ফাহমিদ উর রহমান
সহকারী অধ্যাপক, কমিউনিটি অ্যান্ড সোসাল সাইকিয়াট্রি বিভাগ, এনআইএমএইচ, ঢাকা

মোঃ জহির উদ্দিন
সহকারী অধ্যাপক, সাইকোথেরাপী বিভাগ, এনআইএমএইচ, ঢাকা

ডাঃ অভ্র দাশ ভৌমিক
সহকারী অধ্যাপক, জেরিয়াট্রিক অ্যান্ড অর্গানিক সাইকিয়াট্রি বিভাগ, এনআইএমএইচ, ঢাকা

ডাঃ মোঃ দেলোয়ার হোসেন
সহকারী অধ্যাপক, এডাল্ট সাইকিয়াট্রি বিভাগ, এনআইএমএইচ, ঢাকা

ডাঃ ফারজানা রহমান
সহকারী অধ্যাপক, কমিউনিটি অ্যান্ড সোসাল সাইকিয়াট্রি বিভাগ, এনআইএমএইচ, ঢাকা

ডাঃ হেলাল উদ্দিন আহমেদ
সহকারী অধ্যাপক, চাইল্ড এডোলেসেন্ট অ্যান্ড ফ্যামিলি সাইকিয়াট্রি বিভাগ, এনআইএমএইচ, ঢাকা

ডাঃ মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান খান
সহকারী অধ্যাপক, চাইল্ড এডোলেসেন্ট অ্যান্ড ফ্যামিলি সাইকিয়াট্রি বিভাগ, এনআইএমএইচ, ঢাকা

ডাঃ মেখলা সরকার
সহকারী অধ্যাপক, ফরেনসিক সাইকিয়াট্রি বিভাগ, এনআইএমএইচ, ঢাকা

ডাঃ মোহাম্মদ তারিকুল আলম
সহকারী অধ্যাপক, জেরিয়াট্রিক অ্যান্ড অর্গানিক সাইকিয়াট্রি বিভাগ, এনআইএমএইচ, ঢাকা

ডাঃ সাইফুল নাহার
সহকারী অধ্যাপক, এনআইএমএইচ, ঢাকা

ফ্যামিলি গাইড বই

মানসিক রোগ ও মাদকাসক্তি

ISBN: 978-984-33-9150-6

প্রথম সংস্করণ
ডিসেম্বর ২০১৫

প্রকাশনায়
জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

সহযোগিতায়
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ঢাকা, বাংলাদেশ

মুখবন্ধ

সাম্প্রতিক সময়ে দেশব্যাপী মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশে বয়স্ক জনগণের ১৬.১ শতাংশ যেকোন ধরণের মানসিক রোগে ভুগছেন। জনসংখ্যার হিসাবে এখনই চিকিৎসার প্রয়োজন দেশে এরকম মানসিক রোগীর সংখ্যা প্রায় ২ কোটি ২৫ লক্ষ।

শরীরের মতো মনেরও রোগ হতে পারে। অনেকে মানসিক রোগ সম্বন্ধে অজ্ঞতার কারণে ভ্রান্ত ধারণা, ভীতি, লোকলজ্জা এবং কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে দিন কাটাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসার মাধ্যমে বেশিরভাগ মানসিক রোগের নিরাময় ও নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

'মানসিক রোগ ও মাদকাসক্তি চিকিৎসায় ফ্যামিলি গাইড বই' - সাধারণ জনগণের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে সহজ ও সরল ভাষায় প্রণয়নের চেষ্টা করা হয়েছে।

ইদানিং বাংলাদেশে মাদকাসক্তি তরুণ সমাজে আশংকাজনকভাবে বেড়ে গিয়েছে। মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পরিবারের ভূমিকা অপরিসীম। এ বিষয়টি লক্ষ্য রেখে নতুন সংস্ককরণে মাদকাসক্তি বিষয়টি গুরুত্বসহকারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আব্দুল হামিদ
পরিচালক ও অধ্যাপক
জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

সূচিপত্র

মানসিক সমস্যা কি	১
মানসিক রোগের বিস্তৃতি	১
গুরুত্বপূর্ণ মানসিক রোগসমূহ	১
উদ্বেগাধিক্য বা টেনশন	১
অহেতুক ভীতি বা ফোবিয়া রোগ	২
শুচিবায়ু বা অবসেশন	৩
হিস্টিরিয়া	৪
সিজোফ্রেনিয়া	৫
বিষণ্নতা	৭
বাইপোলার মুড ডিস্‌অর্ডার	৮
মাদকাসক্তি	৯
মৃগীরোগ	১২
বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা	১৩
ডিমেনসিয়া	১৪
শিশু-কিশোরদের মানসিক রোগ	১৬
অটিজম	১৯
গুরুতর বা জটিল মানসিক রোগের ঔষধ খাবার পরে রোগীর কী কী পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে এবং হলে আপনি কি করবেন	২১
মানসিক রোগীদের প্রাথমিক চিকিৎসা পরবর্তী ফলো-আপ চিকিৎসা	২২
মানসিক রোগ বিষয়ক স্বাস্থ্য বার্তা	২২
মানসিক রোগের চিকিৎসা সুবিধা সম্বলিত প্রতিষ্ঠান (সরকারি পর্যায়)	২৩
মানসিক রোগের চিকিৎসা সুবিধা সম্বলিত প্রতিষ্ঠান (বেসরকারি পর্যায়)	২৩

মানসিক সমস্যা কি ?

চিন্তা, আচরণ, ও আবেগের পরিবর্তে যদি ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনযাত্রার গুণগত মান কমে যায়, ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ক ব্যহত হয় এবং তার পেশাগত দক্ষতা হ্রাস পায়, তখন তার মধ্যে মানসিক সমস্যা থাকতে পারে বলে মনে করা হয়।

মানসিক রোগের বিস্তৃতি

২০০৩-২০০৫ ইং সালে দেশব্যাপী শহর ও গ্রামে পরিচালিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণায় দেখা যায় বাংলাদেশে ১৮ বৎসরের উর্দ্ধে জনসংখ্যার ১৬.১ শতাংশ মানসিক রোগে ভুগছে। এর মধ্যে ৮.৪% এ্যাংজাইটি ডিজঅর্ডার, ৪.৬% বিষণ্নতা, ০.৬% মাদকাসক্তি ও ১.১% গুরুতর মানসিক রোগে ভুগছেন। পরবর্তীতে ২০০৯ইং সালে শিশু-কিশোরদের উপর পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা যায় যে, প্রায় ১৮.৪% মানসিক রোগ, ৩.৮% শতাংশ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, ২% মৃগীরোগ এবং ০.৮% মাদকাসক্তি সমস্যায় ভুগছে।

গুরুত্বপূর্ণ মানসিক রোগসমূহ

১. এংজাইটি ডিজঅর্ডারস (অবসেশন বা শুচিবায়ু, ফোবিয়া বা অহেতুক ভীতি)।
২. কনভার্সন ডিসঅর্ডার (হিস্টিরিয়া)।
৩. সিজোফ্রেনিয়া।
৪. ডিপ্রেশন বা বিষণ্নতা রোগ।
৫. বাইপোলার মুড ডিস্অর্ডার।
৬. শিশু-কিশোরদের মানসিক রোগ (অতিমাত্রায় চঞ্চলতা, আচরণগত সমস্যা, বেশি বয়সে বিছানায় প্রসাব, অটিজম)।
৭. মাদকাসক্তি।
৮. মৃগীরোগ।
৯ বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা।
১০. ডিমেনসিয়া।

উদ্বেগাধিক্য বা টেনশন

বিভিন্ন ধরনের মানসিক রোগের মধ্যে টেনশন রোগের প্রবণতা সবচেয়ে বেশী। এ রোগে অস্বাভাবিক আচরণ দেখা না গেলেও এ রোগের কারণে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও পেশাগত কাজকর্মের ব্যাঘাত প্রায়ই ঘটে থাকে। টেনশনের রোগের রয়েছে কার্যকর ঔষধ ও অন্যান্য চিকিৎসা।

কেস/রোল প্লে

মিসেস 'ক' সর্বদাই উৎকণ্ঠিত থাকেন। এই বুঝি তার নিজের বা সন্তানের কোনো ক্ষতি হয়ে গেল। এই উৎকণ্ঠার কারনে সংসারের কোনো কাজ শান্তিমত করতে পারেন না। প্রায় তার বুক ধরফর করে, হাত পা কাঁপে, মুখ শুকিয়ে আসে। প্রায় রাতে ঠিকমত ঘুম আসে না।

টেনশন রোগের উপসর্গ

- সর্বদা উৎকণ্ঠা
- মনে বিপদের ভয়
- ভীতিকর অনুমান
- বিরক্তি ভাব
- অল্প শব্দে বিরক্তিভাব
- অস্থিরতা, মনোযোগের অভাব
- ভীতিমূলক চিন্তা
- মাথা ব্যথা
- ঘুমের সমস্যা
- মুখ শুকনো লাগা
- ঢোক গিলতে কষ্ট হওয়া
- উপরের পেটে অসুবিধা
- পেটে গ্যাস
- ঘন ঘন পাতলা পায়খানা
- বুক চেপে আসা
- নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া
- ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়া
- বুক ধড়ফড় করা
- বুকে অস্বস্তি
- মনে হয় হার্টবিট মিস হয়ে যাবে
- ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া
- সেক্স কমে যাওয়া
- মাসিকের সমস্যা
- মাসিক না হওয়া
- ঘন ঘন মাসিক হওয়া
- হাত-পা কাঁপা
- মাথা ঘুরানো
- মাংসপেশীতে ব্যথা
- ঘুম ভেঙে যাওয়া
- দুঃস্বপ্ন দেখা
- চোখে ঝাপসা দেখা।

অহেতুক ভীতি বা ফোবিয়া রোগ

অহেতুক ভীতির কারণে রোগীর মধ্যে বিভিন্ন শারীরিক মানসিক লক্ষণ তৈরি হয়

লক্ষণ :

১. অযৌক্তিক ভয়।
২. ভীতির উৎস, জায়গা ইত্যাদি এড়িয়ে চলা।
৩. অহেতুক ভীতির কারণে রোগীর স্বাভারিক জীবনযাত্রা ব্যহত হওয়া।

প্রকার:

১. বাইরে যাওয়ার ভীতি
২. সামাজিক ভীতি
৩. সাধারণ ভীতি: ক) উঁচু স্থানে ভয়, খ) বন্ধ ঘরের ভয়, গ) পরীক্ষাভীতি, ঘ) উড্ডয়নের ভয়

এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা একা একা দূরে কোথাও যেতে ভয় পায়। কোলাহলময় জায়গায় যেতে ভয় পায়। তারা উঁচু জায়গায় উঠতে ভয় পায়। অনেক ক্ষেত্রে কিছু জন্তু যেমন- কুকুর, তেলাপোকা, কেঁচো ইত্যাদিকেও ভয় পায়। কেউ কেউ সামাজিক পরিবেশ, যে পরিবেশে তাকে কিছু কিছু লোকের মুখোমুখি হতে হয়, যেমন- বক্তৃতা অনুষ্ঠান, নামাজের জামাত ইত্যাদিতে যেতে সে ভয় পায়।

ফোবিয়া রোগের চিকিৎসা

যে বস্তুকে যত ভয় পাবেন তাকে মোকাবেলা করুন। তাকে এড়িয়ে চলবেন না। সরাসরিভাবে প্রথমে অত্যন্ত টেনশনের সৃষ্টি হবে তা আস্তে আস্তে কমে যাবে। ঔষধ ও বিভিন্ন সাইকোলজিক্যাল চিকিৎসার মাধ্যমে রুগীরাও উপকৃত হয়।

শুচিবায়ু রোগ বা অবসেশন

সাধারণত এই রোগটি 'শুচিবায়ু' নামে পরিচিত। এই রোগে যারা ভোগে তারা সাধারণত একই কাজ বারবার করেন। তাদের ধারণা, কাজটি সম্পূর্ণ হয়নি বা মনমতো করতে পারেননি যেমন- হাত ধোয়া, গোসল করা, ঘরের তালা/দরজা লাগানো, যে কোনো জিনিস পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা ইত্যাদি। অনেক সময় দেখা যায় তারা ঘন্টার পর ঘন্টা একই ধরনের কাজ করে চলছে। আবার কতক ক্ষেত্রে তাদের মাথায় একটা চিন্তা ঢুকলে সে চিন্তাই বারবার করতে থাকে এবং প্রায় সারা দিনই সে চিন্তা করে। রোগী নিজে জানে এই চিন্তা অনর্থক, অর্থহীন। তবুও বাধ্য হয়ে এই চিন্তা তাকে করতে হয়। অনেকের চিন্তার ধরণ ধর্মীয় বিষয় নিয়েও হতে পারে। যেমন- কেউ নামাজ পড়তে বসলে তাৎক্ষণিকভাবে তার মনে হয় আল্লাহ নেই ইত্যাদি। অবসেশন বা শুচিবায়ু রোগে যারা ভোগেন তারা সাধারণত সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করেন, কাজকর্ম ধীর গতিতে করেন, একটু বদমেজাজি থাকেন এবং সর্বদা টেনশন করেন। মেয়েদের মধ্যে অবসেশনের প্রকোপ ছেলেদের চেয়ে একটু বেশি। শিশুদের মধ্যেও অবসেশন পাওয়া যায়। রোগীরা উপরোক্ত অস্বাভাবিক চিন্তা, অস্বাভাবিক অভ্যাস বাদ দিতে চায়; কিন্তু পারে না।

কেস/রোল প্লে

১. মিসেস 'স' এর সমস্যা হচ্ছে তিনি ময়লা লাগার ভয়ে হাত দিয়ে টাকা পয়সা ধরেন না, কিন্তু না ধরেও তো থাকা যায় না, তাই একবার যদি ভুলক্রমে বা নিতান্ত বাধ্য হয়ে হাত দিয়ে টাকা ধরে ফেলেন, তা একেবারে চকচকে নতুন ব্যাংকনোট বা ছেড়াফাটা ময়লা টাকা যাই হোক না কেন এরপর শুরু হয় তার হাত ধোয়ার পালা- একবার দু'বার নয় কমপক্ষে দশ থেকে পনের বার তিনি সাবান-ডেটল ইত্যাদি দিয়ে বারবার হাত ধোবেনই ধোবেন। এতবার হাত ধোয়ার যে কোনো দরকার নেই- নিতান্তই বাড়াবাড়ি তা তিনি নিজেও বুঝেন- নিজেও চাননা এতবার হাত ধুতে কিন্তু বহুবার হাত না ধুয়ে তিনি থাকতেই পারেন না।

অবসেশন রোগের চিকিৎসা

অবসেশনাল রোগীর ভালো চিকিৎসা রয়েছে। ঔষধ নিয়মিতভাবে দীর্ঘদিন ধরে খেতে হয়। এছাড়া রয়েছে নানা রকম বিহেভিয়ার থেরাপি। সর্বশেষ, অবসেশন নির্দিষ্ট মাত্রায় থাকা ব্যক্তির জীবনে অনেক সুফল বয়ে আনে।

হিস্টিরিয়া রোগ বা কনভারশন ডিসঅর্ডার

কনভারশন ডিসঅর্ডার (হিস্টিরিয়া) কি?

কনভারশন ডিসঅর্ডার (Conversion Disorder) ও ডিসোসিয়েটিভ ডিস্‌অর্ডার (Dissociative Disorder) আমাদের দেশে মূলত হিস্টিরিয়া (Hysteria) নামেই বেশী প্রচলিত। এ মানসিক রোগটি আমাদের দেশে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে অত্যন্ত পরিচিত একটি সমস্যা।

'কনভারশন' (Conversion) এর বাংলা শাব্দিক অর্থ 'রূপান্তর' বা এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন। এই রোগে মনের কষ্ট শরীরে প্রকাশ লাভ করে। যেকোন কারণে যখন মনের ভিতর চেপে রাখা কোন মানসিক কষ্ট, যন্ত্রণা, দ্বন্দ্ব ও মানসিক চাপ হঠাৎ করে বিভিন্ন ধরণের শারীরিক/স্নায়ুবিক উপসর্গরূপে প্রকাশিত হয়, তখন তাকে কনভারশন ডিস্‌অর্ডার বলে।

কেস/রোল প্লে

সামনেই এসএসসি পরীক্ষা 'ম' এর, পরীক্ষার দিন চারেক আগে এক বিকেলে তার সারা শরীর কাঁপতে লাগল এবং কিছুক্ষণ পর দেখা গেল তার ডান হাত অবশ হয়ে গেছে- মোটেই নাড়াতে পারছে না - পরীক্ষা দেয়াতো দূরের কথা হাত দিয়ে সামান্য কলমটাও তুলতে পারছে না সে- যথারীতি সাইকিয়াট্রিস্ট এর চিকিৎসার পর দেখা গেল তার হাত আবার আগের মত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে।

এক্ষেত্রে শারীরিক উপসর্গের কোন আভ্যন্তরীণ শারীরিক কারণ থাকে না বরং উপসর্গসমূহ সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তির মানসিক চাপ বা দ্বন্দ্বের কারণেই হয়ে থাকে।

কাদের হয়?

সাধারণত যাদের মানসিক দ্বন্দ্ব ও চাপ মোকাবেলা করার দক্ষতা তুলনামুলকভাবে কম থাকে, তাদের মধ্যে এ রোগ বেশি দেখা যায়। কম বয়সের ছেলেমেয়ে ও তরুণ-তরুণীদের মধ্যে এ রোগের প্রকোপ বেশি। মহিলাদের এ রোগের প্রকোপ পুরুষেদের তুলনায় বেশি হয়ে থাকে।

কনভারশন ডিসঅর্ডারের (হিস্টিরিয়া) লক্ষণসমূহ

কনভারশন ডিস্‌অর্ডার অর্থাৎ মানসিক কষ্টের শারীরিক প্রকাশ নানাভাবে হতে পারে। এ ধরণের উপসর্গ হঠাৎ করে ঘটে এবং এক্ষেত্রে চিকিৎসক সমস্ত শারীরিক ও ল্যাবরেটরী পরীক্ষায় শরীরের অর্ন্তগত কোন কারণ পান না।

লক্ষণসমূহ

- বারবার খিঁচুনী হওয়া, ফিট-হওয়া, হাত-পা বেঁকে যাওয়া, মাথায় অস্বাভাবিক যন্ত্রণা, শ্বাস কষ্ট, দাঁত লাগা ইত্যাদি।
- হঠাৎ করে কথা না বলতে পারা, চোখে না দেখতে পাওয়া, কানে শুনতে না পারা, শরীরে ব্যথা বা স্পর্শের অনুভূতি লোপ পাওয়া, হাত-পা অবশ হয়ে যাওয়া, প্রসাব আটকে যাওয়া ইত্যাদি।
- হঠাৎ করে শরীরের কোন অঙ্গের কর্মক্ষমতা লোপ পাওয়া, যেমন- হাটতে না পারা, হাত দিয়ে কোন কাজ না করতে পারা, গিলতে না পারা ইত্যাদি।
- অনেকক্ষেত্রে রোগী অস্বাভাবিক আচরণ করতে পারে যেমন হঠাৎ পরিচিত জনকে চিনতে না পারা, কোন বিশেষ ঘটনা মনে করতে না পারা, এলোমেলো কথা বলা, অকারণে হাসা, গান গাওয়া, গায়েবী কথা শুনা ইত্যাদি। এসব লক্ষণকে অনেকে 'জ্বীন ভুতের আছর', 'খারাপ বাতাস লাগা' ইত্যাদির মনে করেন যা সম্পূর্ণ ভুল।

উপরোক্ত উপসর্গসমূহের মধ্যে যেকোন একটা অথবা কয়েকটি উপসর্গ একসাথে হতে পারে।

উল্লেখ্য যে, যদিও কন্‌ভারশন ডিসঅর্ডারের কোন শারীরিক কারণ থাকে না, কিন্তু এই রোগের লণসমূহের প্রকাশ রোগীর ইচ্ছাকৃত নয়।

চিকিৎসা: সাইকোথেরাপী ও ঔষধের মাধ্যমে এই রোগী পুরোপুরি ভাল হয়ে যায়।

সিজোফ্রেনিয়া (Schizophrenia)

সিজোফ্রেনিয়া কি?

সিজোফ্রেনিয়া হচ্ছে একটি গুরুতর মানসিক রোগ যেখানে একজন ব্যক্তির চিন্তা, আচরণ ও প্রত্যক্ষণের (Perception) অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। পারিপার্শ্বিকতার প্রতি- আক্রান্ত ব্যক্তির ধারণা পরিবর্তিত হয় এবং তার মধ্যে অমূলক বিশ্বাস (Delusion) জন্মায়। সিজোফ্রেনিয়া একটি দীর্ঘমেয়াদী রোগ। এ রোগের কারণে তার ব্যক্তিগত, সামাজিক ও কর্মক্ষেত্রে স্বাভাবিক সম্পর্ক ও কর্মকান্ডসমূহ ব্যাহত হয়।

সিজোফ্রেনিয়ার লক্ষণ

সিজোফ্রেনিয়ার নানাবিধ লক্ষণ দেখা যায়। তবে কোনো লক্ষণ অল্প সময়ের জন্য কারো মধ্যে দেখা গেলেই ধরে নেয়া যাবে না তার সিজোফ্রেনিয়া আছে। সিজোফ্রেনিয়ার ক্ষেত্রে কমপক্ষে একমাসব্যাপী লক্ষণগুলো উপস্থিত থাকতে হবে। সিজোফ্রেনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষনগুলো হচ্ছে-

কেস/রোল প্লে

২৫ বছর বয়সী যুবক 'গ'। ইদানিং তার আচরণ ও চিন্তায় নানা অস্বাভাবিকতা দেখা দিচ্ছে। সে একা একা বিড়বিড় করে, নিজের যত্ন নেয়না। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে। মাঝে মাঝে সে কানে এমন সব মানুষের কথা শুনতে পায় যারা আশে পাশে নেই। সে জানায় ঐ মানুষেরা তার বিষয়ে নানা কথা বলে। 'গ' মনে করে আশে পাশের অনেকেই তার কোনো ক্ষতি করতে চায়, এজন্য সবাইকে সে সন্দেহ করে, সে মনে করে তার আপনজনদের মধ্যে কেউ তার খাবারে বিষ মিশিয়ে দিচ্ছে। তার আরো মনে হয় যে অন্যেরা তার মনের চিন্তা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। তার ঘুম ঠিকমত হয় না।

- **চিন্তার অস্বাভাবিকতা:** যুক্তিযুক্ত চিন্তা করতে পারেনা, অবাস্তব অলক্ষীক চিন্তা করে। চিন্তার ধারাবাহিকতা হারিয়ে ফেলে, এক চিন্তা থেকে দ্রুত অপ্রাসঙ্গিকভাবে অন্য চিন্তা করা। মনে করতে পারে যে তার চিন্তা অন্য কেউ নিয়ে যাচ্ছে বা রেডিও টিভির মাধ্যমে তার চিন্তা সবাই জেনে যাচ্ছে। আবার কেউ বিশ্বাস করেন যে তার চিন্তার মধ্যে অন্য কারো চিন্তা অনুপ্রবেশ করছে। কোনো বস্তু, বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে বদ্ধমূল ভ্রান্ত বিশ্বাস বা ডিল্যুশন দেখা দিতে পারে।
- **হ্যালুসিনেশন (অলীক প্রত্যক্ষণ):** কোনো ধরণের উদ্দীপনার উপস্থিতি ছাড়াই তা প্রত্যক্ষণ করা। যেমন ঘরে যাদের উপস্থিতি নেই -কানে তার বা তাদের কথা শোনা (গায়েবী আওয়াজ), সামনে কিছু নেই অথচ কিছু দেখা, গায়ে কিছুর স্পর্শ অনুভব করা। সিজোফ্রেনিয়ার ক্ষেত্রে সাধারণত রোগী জানান যে এক বা একাধিক ব্যক্তি তাকে নিয়ে, তার সম্পর্কে বিভিন্ন কথা বলেন এবং তিনি তা শোনেন বলে বিশ্বাস করেন। অথচ বাস্তবে তাদের কারো উপস্থিতি নেই।
- **অহেতুক সন্দেহ:** কোনো কারন ছাড়াই অন্যকে সন্দেহ করা এই সন্দেহ হতে পারে বিশেষ ব্যক্তির প্রতি বা আশেপাশের সবার প্রতি। রোগী মনে করে অন্যেরা তার ক্ষতি করতে চায়, তার খাবারে বিষ মেশাতে চায়, তাকে নিয়ে নানা বদনাম রটাতে চায় ইত্যাদি।
- **বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রিত হওয়া:** এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি মনে করতে পারে যে তার চিন্তা, আচরণ কোনো কিছুই তার নিজের নয়, অন্য কেউ বা বাইরের কোনো শক্তি তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে।
- **নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকা:** অন্যের সাথে কথা বলতে চান না-নিজের ভেতর গুটিয়ে থাকেন। অনেক সময়

খুব কম কথা বলেন, অন্যের চোখে চোখ রেখে তাকান না। কোনো কাজে উৎসাহ বোধ না করা, আবেগের অনুভূতিগুলো কমে যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণও দেখা দেয়।

- কথা ও আচরণে অস্বাভাবিকতা
- **নিজের মনের কথা শোনা:** অনেক সময় নিজে নিজে যা ভাবছেন তা নিজকানে শুনতে পান।
- **অহেতুক উত্তেজনা:** কখনো কোনো কারণ ছাড়াই অতিরিক্ত উত্তেজিত হয়ে উঠা।
- **একা একা কথা:** অনেক সময় রোগী একা একা কথা বলে বা একা একা কোনো কারণ ছাড়াই হাসে বা কাঁদে।
- ঘুমের সমস্যা
- **সমস্যাটিকে অস্বীকার করা:** তার মধ্যে যে কোনো মানসিক সমস্যা আছে এটা তিনি স্বীকারই করতে চান না।
- **স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত:** ব্যক্তিগত, সামাজিক, এবং কর্মক্ষেত্রসহ সর্বত্র তার স্বাভাবিক কর্মকান্ড ব্যাহত হয়।

সিজোফ্রেনিয়া রোগের চিকিৎসা

সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসার জন্য বহির্বিভাগে এবং প্রয়োজনে অন্তঃবিভাগে ভর্তি করে রোগীর চিকিৎসা দেয়া হয়। সিজোফ্রেনিয়া চিকিৎসায় এন্টিসাইকোটিক (Antipsychotic) জাতীয় ওষুধ পর্যাপ্ত মেয়াদ ও পরিমিত মাত্রায় প্রয়োগ করা হয়। ওষুধের পাশাপাশি পারিবারিক সাহায্য সহযোগিতা, সামাজিক সমর্থন, পুনর্বাসন ইত্যাদির প্রয়োজন হয়।

বিষণ্নতা (Depression)

মনখারাপ ও বিষণ্নতা রোগ দুটি আলাদা জিনিস। ছোটখাটো কারণে মন খারাপ হলে আমরা মন খারাপ করি। এটি কিন্তু রোগ নয়, সাময়িক ব্যাপার মাত্র। অপরপক্ষে বিষণ্নতা রোগটি আরেকটু ব্যাপক। মহিলাদের মধ্যে এ রোগে ভোগার প্রবণতা পুরুষদের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ বেশী।

কেস/রোল প্লে

১৯ বছর বয়সী মেয়ে 'ক'। গত এক মাস ধরে তার কিছু ভালো লাগেনা, একা একা থাকে, কারো সাথে কথা বলে না। খুব মন খারাপ থাকে। পড়ালেখা করতে ভালো লাগেনা, তাই রেজাল্ট খারাপ হচ্ছে। মাঝে মাঝে সে একা একা কাঁদে। মনে হয় বেঁচে থাকার চাইতে মরে যাওয়াই ভালো। রাতে ঘুমালে খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যায়। আর ঘুম আসেনা। সারাদিন শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। মনটা সবসময় হতাশ লাগে। হঠাৎ হঠাৎ মাথা ব্যথা করে।

বিষণ্নতা রোগের উপসগ

• দীর্ঘমেয়াদি অশান্তিবোধ • দুশ্চিন্তাবোধ • মন খালি খালি লাগা • আশাহত অনুভুতি ও নেতিবাচক মনোভাব • কোনো কাজে উৎসাহ না লাগা • আনন্দদায়ক কাজে আনন্দ না পাওয়া • নিজেকে অপরাধী ভাবা • ঘুমের সমস্যা • খাদ্যে অরুচি • সেক্স বা যৌনতা সম্পর্কে উৎসাহ কমে যাওয়া

• উৎসাহের অভাব বা ক্লান্তিবোধ • কাজ-কর্মে ধীর হয়ে যাওয়া • মৃত্যুর চিন্তা-ভাবনা • আত্মহত্যার চিন্তা

• মনোযোগের অভাব • অস্থিরতা

• প্রতিটি বিষয় নেগেটিভভাবে দেখা • শরীরে দীর্ঘমেয়াদি ব্যথা ও মাথাব্যথা।

বিষণ্নতা রোগ মাথা থেকে পা পর্যন্ত শরীরের যে কোনো ধরনের কার্যক্রমের ব্যাঘাত ঘটায়, ধীর করে দেয়। শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির পাশাপাশি রোগীর অনেক অর্থনৈতিক ক্ষতিও হয়।

বিষণ্নতা রোগের চিকিৎসা

- প্রাথমিকভাবে সনাক্তকৃত রোগী চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ করবেন।
- চিকিৎসক বিষণ্নতারোধী ঔষধ দিয়ে পর্যাপ্ত মাত্রায় ও মেয়াদে রোগীর চিকিৎসা করবেন। মানসিকরোগ বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে ক্ষেত্রবিশেষে ইলেকট্রোকনভালসিভ থেরাপীর (ECT) মাধ্যমে বিষণ্নতার চিকিৎসা সফল ও নিরাপদভাবে করা সম্ভব।
- বেশীরভাগ ক্ষেত্রে চিকিৎসায় রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে।

বিষণ্নতার ঔষধ একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় নির্দিষ্ট সময় ধরে খেতে হবে। ঔষধ সেবনের ১৫ দিন বা তার বেশি সময়ে রোগীর উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। সামগ্রিক উন্নতি লাভে রোগীকে কমপক্ষে দেড় মাস একটানা ঔষধ খেতে হবে। এই রোগের চিকিৎসায় ঔষধের কোনো কোর্স নেই। চিকিৎসক রোগীর উন্নতি পর্যবেক্ষণ করে ঔষধের ডোজ ধীরে ধীরে কমাবেন এবং তা বন্ধ করবেন। তবে মোটামুটিভাবে বলা যায় রোগীকে ৬ থেকে ৯ মাস কিংবা ১ বছরও ঔষধ সেবন করতে হতে পারে। তবে এটা নিশ্চিত যে আক্রান্ত রোগীরা শতকরা ১০০ ভাগ ভালো হয়ে যায়।

আপনার নিকটস্থ উপজেলা হাসপাতালে মানসিক রোগের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসক রয়েছে। সেখানে যোগাযোগ করুন। চিকিৎসকের পরামর্শমত প্রয়োজনবোধে মানসিক রোগের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে এমন হাসপাতাল বা মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের সাথে যোগাযোগ করুন।

বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডার

বাইপোলার মুড ডিস্‌অর্ডার হচ্ছে একটি আবেগজনিত গুরুতর মানসিক রোগ-যাকে দ্বিপ্রান্তিক মানসিক রোগ বলা যেতে পারে। এ সমস্যার দুই প্রান্তে আবেগের তীব্র বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে। একপ্রান্তে থাকে বিষণ্নতা বা ডিপ্রেশন, যেখানে আবেগের উদ্দীপনা কম থাকে, কোনো কিছুই ভালো লাগে না, দুঃখবোধ হয়। অন্য প্রান্তে থাকে অতি উৎফুল্লতা বা ম্যানিয়া যেখানে আবেগের উদ্দীপনা থাকে বেশি। কোনো ব্যক্তির যদি একবার ম্যানিয়া আর আরেকবার বিষণ্নতা হয় তখন তাকে বাইপোলার মুড ডিস্‌অর্ডার-এর রোগী বলে নির্ণয় করা হয়। রোগীর জীবদ্দশায় কখনো ম্যানিয়া আবার কখনো বিষণ্নতা দেখা যায় এবং মাঝখানের সময়টায় সাধারণত রোগী সম্পূর্ণ ভালো থাকে।

কেস/রোল প্লে

২৭ বছর বয়সী যুবক 'খ'। ইদানিং সে অতিরিক্ত কথা বলছে। নিজেকে অনেক বড় মনে করছে। প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি টাকা খরচ করছে। হঠাৎ করে উত্তেজিত হয়ে উঠে অন্যকে আঘাত করতে যাচ্ছে। বিশ্বাস করে যে তার মধ্যে অস্বাভাবিক ক্ষমতা রয়েছে। এর আগে কিছুদিন তার খুব মন খারাপ ছিল, সে কারো সাথে মিশতো না, কথা কম বলতো মন খারাপ করে থাকতো।

বাইপোলার মুড ডিস্‌অর্ডারের লক্ষণ

এ সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তির কখনো বিষণ্নতা আবার কখনো অতি উৎফুল্লতা (ম্যানিয়া) থাকবে। মাঝের সময়টা সে সাধারণত সুস্থ থাকে, তবে কখনো কখনো একাদিক্রমে বিষণ্নতার পর ম্যানিয়া বা ম্যানিয়ার পর বিষণ্নতা থাকতে পারে।

ম্যানিয়ার প্রধান লক্ষণ হচ্ছে-

- অতি উৎফুল্ল থাকা, সবসময় ফুর্তি আর আনন্দ অনুভব করা, খিটখিটে মেজাজ অথবা রাগান্বিত ভাব।
- অতিরিক্ত ও দ্রুত উচ্চস্বরে বেশি বেশি কথা বলা।
- নিজের সম্পর্কে অযৌক্তিকভাবে উচ্চ ধারণা পোষণ করা, নিজেকে বড় মনে করা।
- অতি দ্রুত চিন্তার ক্ষেত্রে পরিবর্তন করা ।
- অতিরিক্ত কর্মতৎপর হয়ে যাওয়া, শরীর ও মনের অতিরিক্ত শক্তি-ক্ষমতা অনুভব করা।
- মনোসংযোগ কমে যাওয়া।
- অতিরিক্ত খরচ করা।
- হঠাৎ করে রেগে যাওয়া, উত্তেজিত হয়ে অন্যকে আঘাত করা, ভাংচুর করা।
- অপ্রাসঙ্গিকভাবে গান গাওয়া, নাচা ইত্যাদি।
- বদ্ধমূল ভ্রান্ত বিশ্বাস (ডিল্যুশন) ও অলীক প্রত্যক্ষণ (হ্যালুসিনেশন) কখনো কখনো থাকতে পারে।

*** বিষণ্নতা সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা হয়েছে। ফলে এখানে দেয়া হলো না।*

চিকিৎসা

বাইপোলার মুড ডিস্‌অর্ডারের চিকিৎসার জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অন্তঃবিভাগে ভর্তি করে রোগীর চিকিৎসা দেয়া হয়। তবে অবস্থা অনুযায়ী বহির্বিভাগের চিকিৎসা দেয়া যেতে পারে। ঔষধের পাশাপাশি পারিবারিক সাহায্য, সহযোগিতা, সামাজিক সমর্থন, পুনর্বাসন ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। কখনো কখনো ইলেক্ট্রোকনভালসিভ থেরাপি (ইসিটি) দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

মাদকাসক্তি (Substance Use Disorder)

মাদকদ্রব্য হল উত্তেজনা ও অবসাদ সৃষ্টিকারী যে সকল দ্রব্য গ্রহণে মানুষের স্বাভাবিক চেতনা লোভ পেয়ে নেশার সৃষ্টি করে আচরণের পরিবর্তন ঘটায়। মাদকাসক্তি হল নিয়মিত মাদক সেবনের ফলে যাহা মানসিক ও শারীরিক নির্ভরতার জন্ম দেয়, বন্ধ করলে প্রত্যাহারজনিত উপসর্গ দেখা দেয় এবং ক্রমাগত নেশার প্রতি আকর্ষণ ও ব্যবহৃত মাত্রার পরিমাণ দিন দিন বেড়ে যায় ও দৈনন্দিক কাজে সমস্যার সৃষ্টি করে। সাধারণত উঠতি বয়সী তরুণ ও তরুণীদের মধ্যে এর পাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশী। বহু প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে ভাং, গাঁজা, চরস, তাড়ি, সিদ্ধি ইত্যাদি ব্যবহারের ইতিহাস পাওয়া যায়। বর্তমানে হেরোইন, পেথেডিন, ঘুমের বড়ি, এলকোহল, ফেনসেডিল এবং অন্যান্য কফ সিরাপে আসক্তি রোগীর সংখ্যা বেশী। অতিসম্প্রতি ইয়াবা নামক মাদকদ্রব্য গ্রহণ বাংলাদেশে বেড়ে গেছে।

কেস/রোল প্লে

উনিশ বছর বয়সী 'ক'। ইদানিং রাত করে বাড়ি ফেরে। বাবা-মায়ের সাথে অত্যন্ত খারাপ আচরণ করে। কারনে অকারণে টাকা চায়। টাকা না পেয়ে ঘরের জিনিসপত্র ভাঙচুর করে। প্রচুর মিথ্যা বলে। নতুন নতুন বন্ধু তৈরি হয়েছে। সারা রাত দরজা বন্ধ করে জেগে থাকে, সারা দিন ঘুমায়। বাথরুমে বেশি সময় অতিবাহিত করে। পড়া লেখায় খুবই খারাপ ফলাফল করছে। চোখ সবসময় লাল থাকে।

মাদকাসক্তির কারণসমূহ

- মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা: ইহার কারণে মাদকাসক্তির প্রকোপ প্রবল
- মাদকদ্রব্য সমন্ধে কৌতূহল
- বন্ধুদের চাপে মাদক গ্রহণ
- হতাশা, ব্যর্থতা দূর করতে মাদক গ্রহণ
- পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাব
- নিছক আনন্দের জন্য
- পরিবারে মাদকের প্রভাব
- ধুমপানের অভ্যাস

মাদকাসক্তির লক্ষণসমূহ:

শারীরিক লক্ষণসমূহ

- লাল ও ছলছলে চোখ
- ক্ষুধামন্দা, বমিবমি ভাব, বমি হওয়া
- ভারসাম্যহীনতা (Ataxia)
- হাত-পা কাঁপা
- বুক ধড়ফড় করা
- অতিরিক্ত দুর্বল লাগা, ঘুম ঘুম ভাব
- হাত-পায়ের শিরায় সুঁচ ফোটানোর দাগ এবং ফুল হাতা শার্ট পরে এগুলো ঢাকার প্রচেষ্টা
- স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়া এবং খাওয়া দাওয়ার অভ্যাসে পরিবর্তন হওয়া

আচরণগত লক্ষণসমূহ

- লেখাপড়া খারাপ করা
- নিজের ও পোশাক পরিচ্ছদের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন
- যখন তখন বাইরে যাওয়া, অধিক রাতে ঘরে ফেরা
- পরিবারের সবার সাথে সংসারের কাজে এগিয়ে না আসা এবং বেশি বেশি হাত খরচের টাকা-পয়সা চাওয়া
- বিছানার আশপাশে এবং বালিশ ও বিছানার নীচে ট্যাবলেটের খালি ষ্ট্রিপ পড়ে থাকা
- অধিক রাতে নিদ্রা যাওয়া এবং দিনের বেলায় ঘুমানো
- অনেক সময় অপ্রকৃতস্থ অবস্থায় ঘরে ফেরা এবং পরিবারের লোকজনদের সাথে দুর্ব্যবহার করা
- খিটখিটে মেজাজ
- প্রায়ই মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা
- প্রায়ই রাস্তাঘাটে দুর্ঘটনার কবলে পতিত হওয়া
- অসামাজিক ও অপরাধমূলক কাজকর্মে লিপ্ত হওয়া
- নতুন (নেশাগ্রস্থ) বন্ধুবান্ধব হওয়া ও পুরোনো ভাল বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক না রাখা
- কাউকে পরোয়া না করা

মাদকাসক্তির পরিণতি

- ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক কর্মকান্ড ব্যাহত হয়
- বিভিন্ন ধরনের শারীরিক রোগ যেমন- লিভার, কিডনী, ব্রেইন ইত্যাদি অঙ্গের রোগ হতে পারে এমনকি মৃত্যু হতে পারে এমন রোগেও আক্রান্ত হয় যেমন- এইডস্, হেপাটাইটিস ইত্যাদি
- ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যহানী হতে থাকে (ওজন অতিরিক্ত কম বা বেশী হতে পারে)
- যৌন সমস্যা যেমন যৌন অক্ষমতা, পুরুষত্বহীনতা হয়
- গর্ভকালীন সময়ে মাদকাসক্তি হলে গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতি হয়
- ফুসফুস, খাদ্যনালী, পাকস্থলী ইত্যাদির ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে পারে
- অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়া
- লেখাপড়া ও পেশাগত কাজে পিছিয়ে পড়া
- সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া
- আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া
- মানসিক চাপে ভোগে ও আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দেয়

চিকিৎসা

- মাদকাসক্তির চিকিৎসা সাধারণত বাড়িতে চিকিৎসা করা কঠিন। তবে চাইলে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে রেখে চিকিৎসা করা সম্ভব।
- মাদকাসক্তি চিকিৎসার সর্বপ্রথম ধাপ হলো উক্ত ব্যক্তির মাদক ছাড়ার ব্যাপারে যথাযথ মোটিভেশন। মাদকাসক্ত ব্যক্তি যদি মাদক ছাড়ার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয় তবে তাকে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে এসে চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে। মাদক ছাড়ার ব্যাপারে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হচ্ছে মাদক প্রত্যাহারজনিত বিরূপ প্রতিক্রিয়া। প্রত্যাহার জনিত বিরূপ প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন মাদক বিভিন্ন রকম হয়।

- **প্রত্যাহার জনিত সমস্যা-** অস্থিরতা, অনিদ্রা, বমি, ডায়রিয়া, নাক দিয়ে পানি পরা, শরীরে প্রচন্ড ব্যথা বা জ্বালা পোড়া, খিঁচুনী, অতিরিক্ত ঘাম হওয়া, ডেলেরিয়াম (স্থান, কাল পাত্র জ্ঞান না থাকা) ইত্যাদি।
- প্রত্যাহার জনিত সমস্যা মোকাবেলায় এন্টিসাইকোটিক, বেনজোডায়াজিপাম, ক্লোনিডিন জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা হয় এবং হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া উচিত।
- ভর্তির জন্য সরকারী কেন্দ্র অথবা বেসরকারী যে সমস্থ কেন্দ্রে নিয়মিত চিকিৎসক যায় সে সমস্থ কেন্দ্রে যাওয়া উচিত।
- প্রত্যাহার জনিত বিরূপ প্রতিক্রিয়া কমে গেলে কাউন্সিলিং, সাইকোথেরাপী ইত্যাদি দেওয়া হয়।

দীর্ঘ মেয়াদে মাদক মুক্ত থাকার জন্য নিম্নলিখিত উপদেশগুলো মেনে চলা প্রয়োজন-

- যে সমস্ত স্থানে মাদক পাওয়া যায় সে সমস্ত স্থানে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ।
- মাদকাসক্ত বন্ধুদের সম্পূর্ণ বর্জন।
- জীবনযাপন পদ্ধতি পরিবর্তন করে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন পদ্ধতি অবলম্বন।
- কোন সমস্যা বা মানসিক চাপে পড়লে সাইকিয়াট্রিস্ট (মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ) ও সাইকোলজিষ্টদের (মনোবিদ) পরামর্শ নেয়া।
- পরবর্তীতে মাদক গ্রহণ করলে তা সাথে সাথে চিকিৎসককে জানানো।
- নিয়মিত ফলোআপ করা।

মৃগীরোগ

মৃগীরোগ একটি জটিল রোগ এবং মৃগীরোগের কারণে রোগীর নানা রকম মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। এই রোগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো -

• খিঁচুনি হওয়া এবং অজ্ঞান হয়ে যাওয়া • খিঁচুনিকালীন অবস্থায় ছন্দময়ভাবে হাত-পা ও শরীর খিঁচতে থাকে • খিঁচুনির সময় প্রস্রাব পায়খানা করে দেওয়া • দাঁতে দাঁত লেগে যাওয়া • জিহ্বা কেটে রক্ত বের হওয়া • মুখ দিয়ে ফেনা আসা • শরীরের বড় বড় পেশী খিঁচুনি হওয়া • মুখমন্ডল নীল হয়ে যাওয়া এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রস্রাব পায়খানা হয়ে যাওয়া • পরবর্তীতে রোগী অজ্ঞান হয়ে যায় এবং জ্ঞান ফিরলে পূর্বে কী ঘটেছিল তা মনে করতে পারে না • হঠাৎ পড়ে যাওয়া • হঠাৎ ঘাড় বেঁকে যাওয়া • মৃগীরোগ যে কোনো বয়সে হতে পারে তবে শিশু বয়সে বেশি হয় • হঠাৎ করে চুপচাপ হয়ে যাওয়া, হাত থেকে কলম, গ্লাস, ভাতের লোকমা পড়ে যাওয়া • অল্প কিছু সময়ের জন্য অস্বাভাবিক কথা বলা।

এটি কোনো ছোঁয়াচে রোগ নয়। যেহেতু রোগের সাথে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার একটি সম্পর্ক আছে তাই মৃগীরোগীদের শরীরে বা মাথায় আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সে ক্ষেত্রে রোগীকে বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় যেমন- নদীতে বা পুকুরে সাঁতার কাটা, গাছে ওঠা, আগুনের কাছে বা গাড়ী বা যন্ত্রের কাজে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে হবে। তাই এই রোগের ঔষধ বেশি দিন খেতে হয় এবং চিকিৎসাবস্থায় ঔষধ কখনও বন্ধ রাখা যায় না। সব সময় কমপক্ষে ১৫ দিনের ঔষধ বাসায় সংগ্রহ করে রাখা ভাল। মৃগীরোগ সম্বন্ধে আমাদের সমাজে কতগুলো ভুল ধারণা প্রচলিত আছে, যেমন- খারাপ বাতাস লাগা, বিভিন্ন জিনিসের আছর ইত্যাদি।

মৃগীরোগীদের রোগের কারণে বিভিন্ন মানসিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। এগুলোর মাধ্যে রয়েছে -

- বিষণ্নতা রোগ
- উদ্বেগজনিত মানসিক রোগ
- ম্যানিয়া
- ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন
- সন্দেহবাতিক
- অন্যান্য জটিল মানসিক রোগ

হিস্টিরিয়া ও মৃগী রোগের মধ্যে পার্থক্য

হিস্টিরিয়া রোগে রোগী পূর্ণ চেতনা হারায় না বা অজ্ঞান হয় না। যদিও মনে করা হয় সে জ্ঞান হারিয়েছে। মৃগী রোগে রোগী সম্পূর্ণ চেতনা হারায়। হিস্টিরিয়া রোগের খিঁচুনি সাধারণত লোকজনের উপস্থিতিতে হয়। মৃগীরোগের খিঁচুনি একা একা হতে পারে। হিস্টিরিয়া রোগের খিঁচুনি ঘুমের মধ্যে হয় না। মৃগীরোগের খিঁচুনি জাগ্রত অবস্থায় ও ঘুমের মধ্যে হতে পাবে। হিস্টিরিয়ার খিঁচুনির সময় জিহ্বা কাটে না, কাপড়-চোপড়ে প্রস্রাব-পায়খানা হয় না। মৃগীরোগের খিঁচুনিতে রোগী যেহেতু অজ্ঞান হয় সেহেতু যে কোনো জায়গায় পড়ে যেতে পারে এবং আঘাত পেতে পারে। মৃগীরোগের খিঁচুনি সাধারণত ১-২ মিনিটের বেশি থাকে না। হিস্টিরিয়ায় খিঁচুনি দীর্ঘ সময় হতে পারে।

খিঁচুনি ছাড়া আরও কিছু মৃগীরোগ আছে যেমন- স্বল্প সময়ের জন্য অস্বাভাবিক কথা বা আচরণ, কাজের সময় হঠাৎ চুপচাপ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। রোগী পরবর্তী সময় এই বিষয়ে কিছুই মনে করতে পারে না। মৃগী রোগের চিকিৎসার জন্য নিকটস্থ উপজেলা হাসপাতালে যোগাযোগ করুন। আপনার চিকিৎসকের পরামর্শমত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসা নিতে পারেন।

বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা (Mental Retardation)

সমাজ, কাল, পাত্র, ধনী-গরিব সকলের ক্ষেত্রে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী সমস্যা হতে পারে। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানে শিশুর যে বয়সে যতটুকু বুদ্ধি থাকার কথা ঠিক ততটুকু নেই। বুদ্ধির পরিমাণ কতটুকু কম তার ওপর নির্ভর করে মৃদু, মাঝারি ও গুরুতর বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বলা হয়। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্মের পর থেকে বসতে শেখা, হামাগুড়ি দেয়া, হাঁটা, দাঁত ওঠা, কথা বলা ইত্যাদি একটু দেরিতে হয়। নির্দিষ্ট বয়স তারা নিজেদের পোশাক নিজেরা পরতে পারে না, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে পারে না, বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, কোনটি আগুন, কোনটি পানি বোঝে না, রাস্তাঘাটে ঠিকমতো চলাচল করতে পারে না, একটু দূরে ছেড়ে দিলে বাড়িতে ফিরে আসতে পারে না। মানসিক গঠন, মস্তিষ্কের গড়ন, মস্তিষ্কের ক্রিয়া ইত্যাদি ধীরগতিতে হয়। অন্য পাঁচটা শিশু থেকে মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের তাদের কথাবার্তা, চলাফেরা, শারীরিক গঠন ও ব্যবহার দ্বারা সহজেই পৃথক করা যায়। সীমিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যম তাদের অবস্থার উন্নতি করা সম্ভব।

- প্রতিবন্ধী শিশুর পিতা-মাতা জেনে নিন আপনার শিশু কোন্ কোন্ সমস্যা সমাধান করতে পারে আর কোনটা পারে না, শিশু কী ধরনের কাজে প্রশিক্ষণ নিতে উৎসাহিত বোধ করে।
- শিশুর মানসিক বৃদ্ধি কোন স্তর পর্যন্ত হয়েছে তা জেনে নিন।
- প্রতিবন্ধী শিশুর মানসিক স্তর জানার পর তার শিক্ষণীয় বিষয়গুলি সবচেয়ে সহজ থেকে সবচেয়ে কঠিন এই মাত্রায় সাজিয়ে নিন।
- স্তর সাজিয়ে নেয়ার পর প্রশিক্ষণ শুরু করুন, যেমন- গোসল করা, কীভাবে মগ দিয়ে পানি তুলতে হয়, মগ ধরতে হয়, পানি ভর্তি মগ কীভাবে গায়ে ঢালতে হয়। এরপর শেখান কীভাবে গায়ে সাবান মাখতে হয় এবং শরীর পরিস্কার করতে হয়।
- প্রতিদিন একইভাবে এই কাজগুলো কমপক্ষে একমাস বারবার করাতে হবে।
- শিশুর সাথে কাজগুলো বারবার আপনিও করুন তাতে তারা তাড়াতাড়ি শিখতে পারবে।
- খেলার ছলে কাজগুলো করুন।
- ভালোভাবে কাজ শেষ হওয়ার পর শিশুকে তার পছন্দের জিনিস উপহার দিন, প্রশংসা করুন, উৎসাহ দান করুন।
- প্রতিমাসে একবার করে পুরনো কাজগুলো আবার করুন।

এভাবে ভাগ ভাগ করে শিশুকে দাঁত ব্রাস, হাত ধোওয়া, কাপড় খোলা ও পরা, জুতা খোলা ও পরা ইত্যাদি মৌলিক বিষয়গুলো শেখানো। মৃদু বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের সাধারণ স্কুল বা বিশেষ স্কুলে পড়ানো যায়। বয়স বাড়ার পর তাদের দক্ষতা অনুসারে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে এবং কাজে লাগাতে হবে। টেইলারিং, মাছের চাষ, গরু রাখা, মুরগীর ফার্ম, বেতের কাজ বাগান করা ইত্যাদি বিষয়গুলো বুদ্ধি ও দক্ষতা অনুসারে তাদের জন্য প্রয়োজ্য হতে পারে। নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণের জন্য নিকটস্থ সমাজ কল্যাণ অফিস ও যুব উন্নয়ন অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন। বিশেষজ্ঞ হাসপাতাল বা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির নিকট হতে বুদ্ধি বিষয়ক সার্টিফিকেট গ্রহণের পর বিদ্যমান হারে সরকারী ভাতা গ্রহণ করতে পারেন।

মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের সবচেয়ে ভালো প্রশিক্ষক শিশুর মা। অনেক ক্ষেত্রে কী করে কাজ করতে হবে তা শিশুর মা নিজেই বোঝেন না। সেক্ষেত্রে পূর্বে শিশুর মাকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের মাঝে সাধারণ শিশুদের চাইতে মানসিক রোগের প্রকোপ বেশী হয়ে থাকে। তাই মানসিক রোগের চিকিৎসার জন্য নিকটস্থ উপজেলা হাসপাতালে যোগাযোগ করুন। আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ মত বিশেষ হাসপাতাল বা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারেন।

ডিমেনসিয়া (Dementia)

চিকিৎসা ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতির কারণে অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে। যে কারণে বয়োজ্যেষ্ঠ বা প্রবীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ডিমেনসিয়া বা স্মৃতিভ্রংশ নামক মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিমেনসিয়া একটি গুরুতর জৈব-মানসিক রোগ (Organic mental disorder) গবেষণায় দেখা যায় ৬৫ বছর বয়সী নারী-পুরুষের শতকরা ০৫ ভাগ এবং ৮০ বছর বয়সী নারী-পুরুষের শতকরা ২০ ভাগের ডিমেনসিয়া বা স্মৃতি ভ্রংশ রোগ দেখা যায়।

লক্ষণসমূহ

- ডিমেনসিয়ার প্রধান লক্ষণ হচ্ছে স্মৃতি লোপ পাওয়া বা ভুলে যাওয়া। ভুলে যাওয়ার সমস্যা সবচেয়ে বেশি দেখা যায় স্বল্পকালীন স্মৃতির ক্ষেত্রে (একই দিনের বা কয়েকদিন আগের)। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রোগীর প্রয়োজনীয় জিনিস খুজে পেতে সমস্যা হয়। সকালের নাস্তা করে কিছুক্ষণ পর ভুলে গিয়ে আবার নাস্তা চাওয়া, কোন ঘটনা ভুলে গেলে বানিয়ে বলা ইত্যাদি সমস্যা দেখা যায়। কিন্তু রোগী সাধারণত দীর্ঘকাল আগের স্মৃতি ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মনে করতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রোগী নিকটজনের নাম মনে করতে পারে না বা চিনতে পারে না। অনেক সময় বাড়ির বাইরে থেকে ফেরার সময় ভুলে অন্য বাড়িতে চলে যায়। সপ্তাহের সাতটি দিনের নাম যে রোগী ঠিকমত বলতে পারে না তার ক্ষেত্রে ডিমেনসিয়া বা স্মৃতিভ্রংশ রোগ আছে কিনা তা গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় আনতে হবে।
- বিভিন্ন ধরনের আচরণগত সমস্যা যেমন, বিনা কারণে রাগারাগি ও উত্তেজনা প্রকাশ, চিৎকার, না বলে বাইরে ঘুরে বেড়ানো যার ফলে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- ভুলে যাওয়ার কারণে রোগী প্রায়ই প্রয়োজনীয় জিনিস খুঁজে পায় না যেজন্য অন্যদের সন্দেহ করেন।
- রোগী নিজের দৈনন্দিন কাজগুলির (খাওয়া, গোসল, টয়লেট ইত্যাদি) জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অন্যের উপর নির্ভরশীল। অনেক সময় ঘরেই মলমূত্র ত্যাগ করেন।
- বেশিরভাগ রোগীর বিভিন্ন ধরনের মানসিক রোগ যেমন বিষণ্নতা ও উদ্বেগ (প্রায় ৪০-৫০ ভাগ রোগী), অকারণ সন্দেহ (নিকটজনের প্রতি জিনিস চুরির অভিযোগ আনা, সবাইকে শত্রু মনে করা ইত্যাদি) এবং বিভিন্ন ধরনের অলীক ও গায়েবী শব্দ ও কথা শোনা প্রভৃতি সমস্যা দেখা যায়।
- রোগের মাত্রা বেড়ে গেলে ঘুমের সমস্যা (সারা রাত জেগে থাকা), ঘুমের সময় পরিবর্তন হয়ে যাওয়া, দৈনন্দিন ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার অভাব (যেমন ময়লা জামাকাপড়), খাওয়ার সমস্যা (খাবারে অরুচি), যেখানে সেখানে মলমূত্রত্যাগ প্রভৃতি সমস্যা দেখা যায়।
- বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা যেমন তীব্র ধরনের পুষ্টিহীনতা, পানিশূন্যতা, কোষ্ঠকাঠিণ্য, শরীরের বিভিন্ন স্থানে ব্যথা, জীবানু সংক্রমণ (মূত্রথলি ও শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ) দেখা যায়।
- অস্বাভাবিক যৌন আচরণ যা পরিবারের সদস্যদের জন্য খুবই বিব্রতকর ।

ডিমেনসিয়ার পরিণতি

- সাধারণত রোগের লক্ষণ প্রকাশের ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে তীব্র আকার ধারণ করে ।
- বিদ্যমান চিকিৎসায় রোগী ভালভাবে জীবনযাপন করতে পারে যা রোগী ও তার পরিবরের জন্য স্বস্থিদায়ক।

ডিমেনসিয়ার চিকিৎসা

- ডিমেনসিয়ার সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা না থাকলেও বিদ্যমান সাপোর্টিভ বা উপশমকারী চিকিৎসা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ।
- চিকিৎসক রোগীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা নির্ণয় করে সে অনুযায়ী চিকিৎসা করবে

ডিমেনসিয়ার চিকিৎসায় রোগীর পরিবারের করণীয়

- রোগীকে পরিচিত পরিবেশে ও একই বাড়ীতে রাখতে হবে।
- সাধারণ সামাজিক পরিবেশে চলাফেরার সুযোগ প্রদান করতে হবে।
- রোগীদের দৈনন্দিন কাজগুলি (খাওয়া, গোসল) করতে উৎসাহ প্রদান করতে হবে।
- নির্দিষ্ট সময় পর পর টয়লেটে বসিয়ে দিতে হবে যাতে বাইরে মলমূত্র ত্যাগের সমস্যা দূর হয়।
- রোগীকে দিনে ঘুমাতে নিরুৎসাহিত করতে হবে।
- রোগীকে পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার, শাকসব্জি ফলমূল ও তরল খাবার খাওয়াতে হবে।
- ডেলিরিয়াম ও অন্যান্য গুরুতর শারীরিক রোগ (যেমন খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয়া, জ্ঞান হারানো ইত্যাদি) দেখা দিলে রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে।
- রোগীকে যেকোন ধরনের অবহেলা, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন থেকে মুক্ত রেখে সম্মানের সাথে বসবাসের সুযোগ প্রদান করতে হবে।
- চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতিত অন্য কোন ঔষধ সেবন থেকে বিরত থাকতে হবে।
- ডিমেনসিয়ার লক্ষণ সমূহ দ্রুত নির্ণয় করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে এসকল রোগীর জীবনমান উন্নয়ন করে পরিবারে স্বস্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

শিশু-কিশোরদের মানসিক রোগ

শিশু কিশোরদের মানসিক সমস্যাকে তিনটিভাগে ভাগ করা যেতে পারে:

১. বিকাশজনিত মানসিক সমস্যা : যেমন-বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা, অটিজম
২. আবেগজনিত মানসিক সমস্যা: যেমন-স্কুল ভীতি, সেপারেশন অ্যাংজাইটি, বিছানায় প্রস্রাব
৩. আচরণজনিত মানসিক সমস্যা: অতি চঞ্চল অমনোযোগী শিশু, কন্ডাক্ট ডিসঅর্ডার

মনে রাখতে হবে যে একই শিশুর মধ্যে একসাথে একাধিক ধরণের সমস্যা ও লক্ষণ থাকতে পারে:

অতি চঞ্চল অমনোযোগী শিশু (এটেনশন ডিফিশিট হাইপারএকটিভিটি ডিসঅর্ডার-এডিএইচডি)

চঞ্চলতাকে ছাপিয়ে একটি শিশু যখন অতিমাত্রায় অমনোযোগী হয়ে উঠে, বাড়ি বা স্কুল কোথাও মুহূর্তের জন্য মনসংযোগ করতে পারে না, হঠাৎ রেগে কাউকে আঘাত করে তখন এ ধরণের অমনোযোগিতা আর সাথে অত্যধিক অস্থিরমতি হয়ে থাকাটাকে অসুস্থ'তা হিসেবে গণ্য করা হয়- এ রোগটিকে বলা হয় অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপারএকটিভিটি ডিসর্অডার, বাংলায় বলা যেতে পারে 'অতি-চঞ্চল অমনোযোগী শিশু'।

লক্ষণ

- একমুহূর্ত চুপ করে বসে না, অতিরিক্ত চঞ্চলতা করে
- অত্যাধিক ছোটাছুটি করে
- প্রায়শই শরীরে আঘাত পায়
- অনেক সময় কথা বেশি বলে
- ঘরের জিনিসপত্র বেশি নাড়াচাড়া করে, ভেঙে ফেলে
- কোনো বিষয়ে বেশিক্ষণ মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না এমনকি খেলাধুলাতেও
- হঠাৎ করে কোনো কারণ ছাড়াই উত্তেজিত হয়ে উঠে
- কোনো কাজ গুছিয়ে করতে পারে না, নিজের জিনিস গুছিয়ে রাখতে পারে না, স্কুলে গেলে প্রায় প্রতিদিনই কিছু হারিয়ে আসে
- অন্যের কথায় ও কাজে বাধা দেয়

অভিভাবকদের করণীয়

- রুটিন তৈরি করা, ও তা মেনে চলতে উৎসাহিত করতে হবে
- বাসার জন্য নিয়ম তৈরি করা ও সকলে তা মেনে চলা
- ভালো কাজের পুরস্কার দিতে হবে
- বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতা
- শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করতে হবে
- কৃত্রিম রঙযুক্ত খাদ্য বর্জন করতে হবে
- শিশুর সাথে রূঢ় আচরণ পরিহার করতে হবে
- অনাকাক্ষিত আচরণের দিকে মনোযোগ না দেয়া
- একা একা খেলা যায় এমন খেলাকে উৎসাহিত করতে হবে
- চিকিৎসা গ্রহণ: চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলুন। নিয়মিত ওষুধ খাওয়ান এবং চিকিৎসক নির্দেশিত আচরণবিধি মেনে চলুন।

শিশুর বিছানায় প্রস্রাব

- সাধারণত ৪-৫ বছর বয়সের মধ্যেই একটি শিশু তার প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে। প্রয়োজনে মা-বাবার সাহায্য নেয়। কিন্তু কোনো কোনো সময় এই বয়সের পরেও বিভিন্ন কারণে শিশুটির প্রস্রাব ধরে রাখার ক্ষমতা রপ্ত হয়না। তখন সে ঘুমালে, বিশেষ করে রাতে বিছানা ভেজায়।
- এ সমস্যা মানসিক কারণ ছাড়াও শারীরিক (মূত্রাশয় এর রোগ) কারণেও হতে পারে- তাই শারিরীক রোগের জন্যও প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা লাগতে পারে।
- পরিবারে এ ধরণের সমস্যা ভাই বোন বা বাবা-মার থাকলে, মানসিক চাপযুক্ত পরিবেশে বেড়ে উঠলে, পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় না হলে, মা এর কাছ থেকে কোনো কারণে শিশুটি দূরে থাকলে, বারবার বাসা বদলালে, নতুন ভাই বা বোনের জন্ম হলে, এবং শিশু যদি মানসিক বা শারিরীক নির্যাতনের শিকার হয় তবে এ রোগের সম্ভাবনা বাড়তে পারে।
- শিশুর যাতে এ সমস্যা না হয় সেজন্য ২০ মাস বয়স থেকেই তাকে প্রস্রাব পায়খানা নিয়ন্ত্রন করার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এই প্রশিক্ষণ দিতে হবে ধীরে ধীরে ধৈর্য নিয়ে- হঠাৎ করে তার কাছ থেকে আশা করা ঠিক হবেনা যে সে এক রাতের মধ্যে সব শিখে ফেলবে।
- অনেক সময় শিশু তার নিজস্ব অভিব্যক্তির মাধ্যমে প্রস্রাব করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে- সেগুলো বোঝার চেষ্টা করুন ও তাতে সাড়া দিন।
- রাতে ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে নির্দিষ্ট সময় পরপর তাকে বাথরুমে নিয়ে যান এবং প্রস্রাব করার জন্য তাকে উৎসাহিত করুন।
- শিশুর খাদ্য তালিকায় আঁশযুক্ত খাবার যুক্ত করুন- এত তার কোষ্ঠ্যকাঠিন্য হবে না, ফলে বাথরুমে যেতে তার অনিচ্ছা অনেকাংশে কমে যাবে।
- যথেষ্ট বয়স হওয়া সত্ত্বেও (৫-৬ বছর) বিছানায় প্রস্রাব করে এমন শিশুর জন্য কিছু নিয়ম নীতি মেনে চলুন- যেমন- সন্ধ্যার পর শিশুকে অতিরিক্ত পানি পান করাবেন না, যে রাতে বিছানা ভেজাবে সে রাতে তাকেও ঘুম থেকে তুলুন ও তার ভেজা কাপড়, কাঁথা, বিছানার চাদর বদলানোর সময় তাকেও ছোটখাট কিছু কাজ করতে দিন। আবার যে রাতে সে বিছানা ভেজাবেনা তার পরবর্তী সকালে তাকে ছোট কোনো উপহার দিয়ে পুরস্কৃত করুন। ক্যালেন্ডারে দাগ দিয়ে হিসাব রাখুন-মাসে কতদিন সে বিছানা ভেজায় আর কতদিন ভেজায় না। ক্যালেন্ডারটি তাকে দেখান এবং যে কটি দিন সে বিছানা ভেজায় না তা হিসেব করে ততটি চকলেট বা ছোট স্টিকার তাকে উপহার দিন। প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক কলিংবেলযুক্ত বিশেষ ধরণের বিছানা ব্যবহার করা যেতে পরে।

স্কুল ভীতি

- স্কুলগামী অনেক শিশু নানাকারণে স্কুলে যেতে চায় না। দেখা যায় স্কুলে যাবার ঠিক আগে আগে তাদের কেউ অহেতুক কান্নাকাটি করে- কেউ পেট ব্যথায় মাটিতে গড়ায়, কারো মাথা ব্যথা হয় আবার কেউবা ওয়াক ওয়াক করে বমির ভাব করে।
- প্রথমবার স্কুলে যাওয়া শুরু করলে, স্কুলে বন্ধুরা উত্যক্ত করলে, টিটকারি দিলে, তাকে নিয়ে অযথা হাসাহাসি করলে, হঠাৎ স্কুল পরিবর্তণ করলে, শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন হলে (বাংলা মাধ্যম থেকে ইংরেজী, ইংরেজী মাধ্যম থেকে বাংলা বা সাধারণ শিক্ষা থেকে মাদ্রাসা শিক্ষা), লম্বা ছুটির পর স্কুলে যাবার সময়, পরিবারের কোনো নিকটজনের মৃত্যু হলে, মা-বাবার মধ্যে দাম্পত্য কলহ হলে, স্কুলের পড়ার সাথে তাল মেলাতে না পারলে, পরিবারের কোনো সদস্য প্রতিনিয়ত তার স্কুলে যাওয়াকে নিরুৎসাহিত করলে, শিক্ষকের আচরণ রূঢ় হলে অথবা শিশুর সত্যিকারের কোনো শারীরিক সমস্যা থাকলে তার মধ্যে স্কুলভীতি দেখা দিতে পারে।
- মা-বাবা শিশুকে আশ্বস্থ করবেন। স্কুল সম্পর্কে শিশুকে ইতিবাচক ধারণা দেবেন। দীর্ঘদিন স্কুলভীতি থাকলে প্রথমে তাকে স্কুল সময়ের বাইরে যেমন ছুটির দিনে বা বিকেলে স্কুল প্রাঙ্গনে বেড়াতে নিয়ে যাবেন। এরপর স্কুল সময়ে তাকে অল্প অল্প করে স্কুলে থাকা অভ্যাস করাতে হবে- এবং একসময় পূর্ণ সময়ের জন্য স্কুলে রাখতে হবে।

- এ বিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ বা শিক্ষকের সাথে খোলামেলা আলাপ করতে হবে। শিশুর সাথে তার পড়ালেখার সমস্যা থাকলে সেটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে- অযথা তাকে কোনো প্রতিযোগিতার মুখে ঠেলে দেয়া যাবে না। ভালো ফল করতেই হবে এমন কোনো শর্ত তার উপর আরোপ করা চলবে না।
- শিশুর স্কুলচলাকালীন সময়ে বাসায় কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা চলবে না।
- শিশুকে দৈনন্দিন রুটিন তৈরি করে দিতে হবে ও তা মেনে চলার অভ্যাস করাতে হবে।
- শিশুর ভুলত্রুটি নিয়ে সমালোচনা করা যাবে না। শিশুকে 'তুই-তোকারি' সম্বোধননা করাই ভালো। পড়াশোনায় পিছিয়ে থাকা শিশুটির জন্য বাড়তি যত্ন নিতে হবে।

অনাকাঙ্খিত আচরণ (কন্ডাক্ট ডিসঅর্ডার)

- অনেক শিশু কিশোর তাদের স্বভাবসুলভ আচরণ না করে অভিভাবকের অবাধ্য হয়ে ওঠে এবং নানান অনাকাংক্ষিত আচরণ করে। সমাজের সাথে তারা সঠিকভাবে মিশতে পারেনা। তাদের এ সমস্যাকে বলা হয় 'কন্ডাক্ট ডিজঅর্ডার' বা আচরণজনিত সমস্যা।
- এ ধরণের সমস্যা শিশুর আচরণগত মানসিক সমস্যা। বাবা-মা যদি কোনো অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত থাকেন, সমাজবিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত থাকেন, ছোটবেলায় যদি শিশুর বেড়ে ওঠা সঠিকভাবে না হয়, পিতা-মাতার সাথে শিশুর সম্পর্ক যদি গতানুগতিক ও স্বাভাবিক না হয়, শিশু যদি শৈশবে কোনে ধরণের শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়, যদি স্কুলের পরিবেশ শিশুর জন্য প্রতিকুল থাকে,যদি শিশুর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ভালো না হয় তবে শিশুর আচরণের সমস্যা হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আবার উপরের কোনো কারণের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও শিশু-কিশোরদের আচরণগত সমস্যা হতে পারে। আবার জেনেটিক কারণেও এ ধরণের সমস্যা হতে পারে।
- এ ধরণের সমস্যায় আক্রান্ত শিশু কিশোরদের মধ্যে যে লক্ষণগুলো দীর্ঘসময় ধরে বিদ্যমান থাকতে পারে তা হলো- অন্যদেরকে উপহাস, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা, হুমকি দেয়া বা আতংকিত করার চেষ্টা করা; হঠাৎ করে মারামারিতে জড়িয়ে পড়া; মারামারির সময় অস্ত্র ব্যবহার করা; অন্য মানুষদের নিষ্ঠুরভাবে শারীরিক পীড়ন করা; বিভিন্ন পশু পাখির প্রতি নির্দয় হওয়া- যেমন বেড়াল, কুকুর বা পাখিদের কষ্ট দেয়া বা হত্যা করা; চুরি করা; মিথ্যা বলা; অন্যকে যৌন হয়রানি করা; কোনো কিছু নষ্ট করার জন্য আগুন লাগিয়ে দেয়া; বিনা কারণে অন্যের সম্পত্তির ক্ষতি করা; বিনা কারণে ঘর বা গাড়ি ভাঙচুর করা; সবসময় অভিভাবকের বিরুদ্ধাচারণ করা; বিনা অনুমতিতে, কোনো যোগাযোগ না করে রাত্রে বাসার বাইরে থাকা; গভীর রাতে বাসা থেকে একাধিকবার বের হযে যাওয়া এবং প্রায়শই স্কুল পালানোর অভ্যাস থাকা।
- এ আচরণজনিত সমস্যার জন্য শিশুর প্রতি, তার পরিবারের প্রতি এবং তার চারদিকের পরিবেশের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে। শিশুকে তার আচরণ পরিবর্তনের জন্য সুযোগ দিতে হবে। প্রথমেই সমাজের চোখে তাকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে না। তাকে সামাজিক দক্ষতা শেখার জন্য ছোট ছোট সামাজিক আচরণ রপ্ত করাতে হবে। ছোট ছোট সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায এ বিষয়ে তাকেই সিদ্ধান্ত নেবার সুযোগ করে দিতে হবে। প্রয়োজনে তাকে বিশেষজ্ঞের তত্বাবধানে 'কাউন্সেলিং' ও প্রয়োজনীয় সাইকোলজিকাল চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। চিকিৎসকের পরামর্শ মত তাকে ওষুধ সেবন করাতে হবে।
- শিশুর পিতা মাতাকে হতে হবে সহনশীল। অযথা রূঢ় আচরণ করা চলবে না। নিজেদের মধ্যে সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন আরো দৃঢ় করতে হবে। শিশুর সামনে দাম্পত্য বা পারিবারিক কলহ পরিহার করতে হবে। শিশুকে নিয়ে সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে হবে এবং সপরিবারে বেড়াতে যেতে হবে। শিশুর প্রতি যেমন রূঢ় হওয়া চলবে না তেমনি অত্যাধিক আদরও তাকে দেয়া যাবে না- যখন তখন তার সকল আব্দার মেটানো চলবে না। শিশুকে নৈতিকতাবোধ, ধর্মীয় অনুশাসন এবং দেশীয় সংস্কৃতি শিক্ষা দিতে হবে। পরিবারের পাশাপাশি এ ধরণের শিশুদের প্রতি সমাজকেও হতে হবে সহনশীল ও সহানুভূতি সম্পন্ন। শাস্তির বদলে তাকে সংশোধনের উদ্যোগ নিতে হবে। 'ভালো কাজের জন্য প্রশংসা-পুরষ্কার এবং মন্দ কাজের জন্য পুরষ্কার-প্রশংসা বন্ধ'- এ নিয়ম অনুসরণ করতে হবে।

অটিজম

কিছু শিশু রয়েছে যারা নিজের ভেতর গুটিয়ে থাকে, সামাজিকভাবে আর দশটা শিশুর মত বেড়ে উঠেনা এবং তাদের আচরণে কিছু অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। এ ধরণের লক্ষণ থাকলে তাকে বলা হয় অটিজম। যেসব শিশুর অটিজমের সমস্যা আছে তাদের বলা হয় অটিস্টিক শিশু। বেশিরভাগ অটিস্টিক শিশুর ক্ষেত্রে বয়স ৩ বছর হবার আগেই লক্ষণগুলো দেখা দেয়।

প্রধানত যে তিনটি ক্ষেত্রে অটিজম এর সমস্যা দেখা যায়

অটিজমের সাধারণ লক্ষণসমূহ

- শিশুর ভাষা শিখতে সমস্যা
  - -- একবছর বয়সের মধ্যে 'দা..দা ' 'বা..বা' 'বু..বু' উ"চারণ না করা
  - -- দুই বছর বয়সের মধ্যে অর্থপূর্ণ দুটি শব্দ দিয়ে কথা বলতে না পারা
- শিশু যদি চোখে চোখ না রাখে
- নাম ধরে ডাকলে সাড়া না দেয়
- অন্যের সাথে মিশতে সমস্যা হয় এবং আদর নিতে বা দিতে সমস্যা হয়
- হঠাৎ করে উত্তেজিত হয়ে উঠে
- সামাজিক সম্পর্ক তৈরিতে সমস্যা
- পছন্দের বা আনন্দের বস্তু/বিষয় সে অন্যদের সাথে ভাগাভাগি করতে না পারা
- অন্যের বলা কথা বার বার বলে
- বার বার একই আচরণ করা
- শব্দ, আলো, স্পর্শ ইত্যাদি বিষয়ে কম বা বেশি প্রতিক্রিয়া দেখানো
- একটি নিজস্ব রুটিন মেনে চলতে পছন্দ করা, আশেপাশের কোনো পরিবর্তন সহ্য করতে না পারা
- নিজেকে আঘাত করার প্রবণতা
- পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে না পারা

অটিজমের সাথে অন্যান্য যেসব সমস্যা থাকতে পারে

- খিঁচুনি (মৃগী)
- অতিচঞ্চলতা (হাইপারএকটিভিটি)
- স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন
- হাতের কাজ করতে জটিলতা
- বিভিন্ন ধরনের শারীরিক সমস্যা- খাওয়া ও ঘুমের সমস্যা ইত্যাদি

অটিজম এর পরিচর্যা ও সেবা

নিচের বিষয়গুলোর উপর লক্ষ্য রেখে শিশুর অটিজমের চিকিৎসাসেবা দেয়া হয়-

- শিশুর অস্বাভাবিক আচরণ পরিবর্তনের জন্য শিশুর বাবা মাকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন; যাতে তারা বাড়িতে শিশুর আচরণের পরিবর্তন করতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন।
- শিশুর অনাকাঙ্খিত আচরণের দিকে মনোযোগ দিবেন না, কাংক্ষিত আচরণের জন্য তাকে উৎসাহিত করুন।
- সাধারণ মূলধারার স্কুলে প্রেরণ।
- স্কুলের পাশাপাশি বাড়িতেও শিশুকে সামাজিক রীতিনীতি শেখানোর চেষ্টা করুন, সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
- যে কাজটি সে ভালো পারে বা যে বিষয়টিতে তার উৎসাহ আছে সে বিষয়টির দিকে বাড়তি গুরুত্ব দিতে হয়।
- প্রয়োজনে বিশেষায়িত স্কুলে প্রেরণ
- শিশুর ভাষা শিক্ষার দিকে গুরুত্ব দিন। ছোট ছোট শব্দ দিয়ে তার ভাষার দক্ষতা বাড়ানোর চেষ্টা করুন।
- তার সাথে স্বাভাবিকভাবে স্পষ্ট করে কথা বলুন।
- প্রয়োজনে তাকে ইশারা ইংগিতের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করতে সাহায্য করুন এবং ইশারার তাৎপর্য বোঝানোর চেষ্টা করুন।
- প্রয়োজন অনুযায়ী রোগের লক্ষণ অনুযায়ী কিছু ওষুধ প্রদান ও সাইকোথেরাপিও প্রয়োজন হতে পারে- তবে তা অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী

অটিজমঃ কোথায় সহায়তা পাবেনঃ

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, 'সেন্টার ফর নিউরোডেভেলপমেন্ট এন্ড অটিজম ইন চিলড্রেন' বিভাগ, শাহবাগ, ঢাকা।
- জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, 'চাইল্ড গাইডেন্স ক্লিনিক', শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ঢাকা শিশু হাসপাতাল, 'শিশু বিকাশ কেন্দ্র', ঢাকা
- সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, ঢাকা এবং 'প্রয়াস', বিশেষায়িত স্কুল, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট
- মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এর শিশুরোগ/মনোরোগবিদ্যা বিভাগ
- নিকটস্থ জেলা সদর হাসপাতাল/উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
- সরকার অনুমোদিত বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও বিশেষায়িত স্কুল

গুরুতর বা জটিল মানসিক রোগের ঔষধ খাবার পরে রোগীর কী কী পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে এবং হলে আপনি কি করবেন

ঔষধ খাবার পরে রোগীর বর্ণিত সকল উপসর্গই ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নয়। ঔষধে কি কি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয় বা হতে পারে, তা নীচে বর্ণনা করা হলো।

যে সকল কারণে ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে -

রোগীদের মধ্যে যাদেরকে Inj. Fluphenazine Decanoate 25 mg, Inj. Fluanxol 20 mg, Inj. Fluanxol 40 mg, Inj. Clopixol Depot 200 mg, Inj. Haloperidol Decanoate 50 mg, Inj. Clopixol Acuphase 50 mg/100 gm, & Tab. Peridol, Tab. Perol, Tab. Perigen, Tab. Halop, Tab. Telazin 5 mg, Tab. Stela- 5 mg -এই জাতীয় ঔষধ দেয়া হয় এবং তারা যদি (১) সব ঔষধ ঠিকমত না খায় (২) ঔষধ অনিয়মিত খায় (৩) ঔষধ খেতে খেতে বাদ দেয় (৪) ঔষধ যদি শেষ হয়ে যায়, তাহলে তাদের মধ্যে যে সকল পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে-তা হলোঃ হাত পা কাঁপা, চোখ উপরে উঠে যাওয়া, মুখ দিয়ে লালা পড়া, শরীর বেঁকে যাওয়া, মুখ বেঁকে যাওয়া প্রভৃতি।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলে কি করবেন

(১) উপরের ঔষধগুলোর মধ্যে যে ঔষধ রোগী সেবন করে তা বন্ধ করতে হবে (২) ঘাবড়াবেন না, এটি সাময়িক (৩) Tab. Perkinil, Tab. Kdrine (5 mg) অথবা Tab. Cyclid (5 mg) ২টা করে তিন বেলা খাওয়াতে থাকুন (৪) রোগীকে তাৎক্ষণিক নিকটস্থ চিকিৎসক বা উপজেলা হাসপাতালে নিন। তাঁদের পরামর্শ মত প্রয়োজন হলে মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ বা মানসিক চিকিৎসা পাওয়া যায় এমন হাসপাতালে নিন।

মনে রাখবেন এই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সাময়িক। চিকিৎসা প্রদানের অল্প সময়ের মধ্যে তা ঠিক হয়ে যায়।

মানসিক রোগীর ঔষধ খাওয়ার পর কিছু মৃদুমাত্রার সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কথা ও তার প্রতিকার

১) ঘুম বেশি হলে- ঘুমিয়ে নেবেন। কড়া চা/কফি খেতে পারেন, একটু হাঁটাহাঁটি করুন। (২) পায়খানা কষা হলে- ইসুবগুলের ভুষি দিয়ে শরবত বানিয়ে তিন-চার বেলা খান, মওসুমি সব্জী খান, দুধ, পেঁপে খান, পানি, ORS, লবণ-লেবুর শরবত, শাক-সব্জি বেশি খান। তাতে উপকার না হলে- Tab. Duralax ২টা রাতের বেলা খান বা Milk of Magnesia ৪ চামচ রাতে খান বা তাতেও উন্নতি না হলে পার্শ্ববর্তী হাসপাতালে গিয়ে ডুশ দিয়ে নিন। ৩) পায়খানা পাতলা হলে-ORS খান, ৪) চোখে ঝাঁপসা লাগলে- পড়ার জিনিস একটু দুরে সরিয়ে নিয়ে পড়ুন। এটি সাময়িক, অল্প কয়েক দিনের মধ্যে সেরে যাবে- ধৈর্য্য ধরুন। ৫) মুখ শুকিয়ে গেলে- অল্প অল্প করে পানি খান। মুখে সুপারি, চুইংগাম, আদা রাখতে পারেন। ৬) বসা ও শোওয়া থেকে উঠতে গেলে মাথা চক্কর লাগলে ধীরে ধীরে উঠুন, বিশেষ করে বাথরুম করার সময়। শোয়া থেকে উঠতে- প্রথমে বসুন, তারপরে দাঁড়ান। বেশি পরিমাণে চক্কর লাগলে- ORS খেতে পারেন, লিকুইড পথ্য খেলে ভালো লাগবে। ৭) যারা Tab. Camcolit, Tab. Lithosun খাচ্ছেন- তারা যদি হাতে কাঁপুনি অনুভব করেন, বমি ভাব হয়, শরীর কাঁপে, তাহলে- উপরের ট্যাবলেটগুলো বন্ধ করে দিন। তাৎক্ষণিক ORS বা লবন-শরবত বেশি বেশি খাবেন। জরুরিভাবে নিকটস্থ চিকিৎসক বা উপজেলা হাসপাতালে যোগাযোগ করুন। ৮) রোগীকে ঔষধ ও পথ্য না খাওয়াতে পারলে যেকোন ভাবেই হোক তাকে সঠিক নিয়মে ঔষধ ও পথ্য খাওয়ানোর চেষ্টা করুন।

আপনার কাছাকাছি উপজেলা হাসপাতালে মানসিক রোগের প্রশিণপ্রাপ্ত চিকিৎসক রয়েছেন। সেখানে যোগাযোগ করুন। চিকিৎসকের পরামর্শমত প্রয়োজনবোধে কাছাকাছি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা, মানসিক হাসপাতাল পাবনা অথবা মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের সাথে যোগাযোগ করুন।

মানসিক রোগীদের প্রাথমিক চিকিৎসা পরবর্তী ফলো-আপ চিকিৎসা

মানসিক রোগীদের চিকিৎসা সাধারণত তুলনামূলক বেশি সময় ধরে চালাতে হয়। বিশেষ করে সিজোফ্রেনিয়া, ম্যানিয়া, ডিপ্রেশন, এ্যাংজাইটি, শুঁচিবাই সহ কিছু কিছু রোগের চিকিৎসা দীর্ঘসময় চালাতে হয়। তাই পরামর্শ মত রোগীকে মাঝে মাঝে চিকিৎসককে দেখাতে হয়। চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতিরেকে হঠাৎ ঔষধ বন্ধ করা হলে তাৎক্ষণিক বমি, হাত-পা কাঁপা, লালা পড়া, ঘাড় বাঁকা হয়ে আসা, ঘুম কমে যাওয়া ইত্যাদি সমস্যা হতে পারে। তাছাড়া ঔষধ বন্ধের কারণে হঠাৎ করে অসুখের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে। ডাক্তারের পরামর্শ মত চিকিৎসা নিলে রোগী ভাল থাকবে এবং দৈনন্দিন কাজ-কর্ম, চাকুরী ও ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে সক্ষম হবে।

মানসিক রোগ বিষয়ক স্বাস্থ্য বার্তা

- মানসিক রোগীকে ভয় দেখানো-ধমক দেয়া সঠিক নয়।
- মারধর, সমালোচনা, অতি যত্ন, কম যত্ন মানসিক রোগীর জন্য ক্ষতিকর।
- অস্বাভাবিক আচরণ, অশান্তি, আত্মহত্যার প্রবণতা, অস্থিরতা, মাথা-ব্যাথা, শরীর ব্যাথা, দাঁত লাগা, যৌন সমস্যা, নিদ্রাহীনতা ইত্যাদি মানসিক রোগের সাধারণ লক্ষণ। এধরনের সমস্যা হলে উপজেলা হাসপাতালে যোগাযোগ করুন।
- বিষণ্নতা অন্যতম প্রধান মানসিক রোগ। চিকিৎসার জন্য নিকটস্থ উপজেলা হাসপাতালে যোগাযোগ করুন।
- পারিবারিক উৎসব আনন্দ ও কর্মময় জীবন মানসিক রোগ ও মাদকাসক্তি প্রতিরোধ সহায়ক। পারিবারিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করুন।
- বিয়ে সাধারণত মানসিক রোগের চিকিৎসা নয়। নিকটস্থ উপজেলা হাসপাতালে ডাক্তারী চিকিৎসা গ্রহণ করুন।
- সমাজের সকলের মত মানসিক রোগীদেরও রয়েছে সমান অধিকার। মানসিক রোগীর আইনগত অধিকার রক্ষায় সহযোগিতা করুন।
- মানসিক রোগীর ঔষধ ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া বন্ধ করবেন না। প্রয়োজনে উপজেলা হাসপাতালে যোগাযোগ করুন।
- সন্তানদের ভালকাজে উৎসাহিত ও পুরস্কৃত করুন। মাদকাসক্তি প্রতিরোধ করুন।
- আপনার এলাকার স্বাস্থ্য কর্মী, সেবিকা ও চিকিৎসক মানসিক রোগের চিকিৎসা বিষয়ে অবগত আছেন। তাঁদের সাথে যোগযোগ করুন।
- নিকটস্থ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকাস্থ জাতীয় মানসিক হাসপাতাল ও পাবনা মানসিক মানসিক হাসপাতালে মানসিক রোগী ভর্তির সুযোগ রয়েছে। আপনার চিকিৎসকের পরামর্শমত এ সুয়োগ গ্রহণ করুন।
- জন্মকালীন মাথায় আঘাত শিশুর মৃগী ও মানসিক রোগের অন্যতম কারণ। নিরাপদ প্রসবের জন্য উপজেলা হাসপাতালে যোগাযোগ করুন।
- পরিবারের সহায়তায় মানসিক রোগীকে কাজে নিয়োগ করুন। তাদের পুনর্বাসনে উদ্যোগ নিন।
- মানসিক রোগী মানেই 'পাগলামি' নয়। শরীরের যেমন রোগ হয় মনেরও তেমনি রোগ হয়, তাই মনোরোগের ডাক্তারী চিকিৎসা নিতে হবে।
- মানসিক রোগীকে 'পাগল' বলবেন না এদের প্রতি সহানুভূতি দেখান, চিকিৎসা দিন।
- মনের কারণেই অনেকসময় যৌন সমস্যার সৃষ্টি হয়।
- বেশিরভাগ আত্মহত্যা ও বিবাহ বিচ্ছেদের পেছনে মানসিক সদস্যা দায়ী, দেরি না করে মনোচিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- অনেক মানসিক রোগের শারীরিক প্রকাশ রয়েছে, যেমন মাথা ব্যথা, শরীর জ্বালা পোড়া ইত্যাদি।
- অপচিকিৎসা ও কুসংস্কার যেমন- মারধর, পানিপড়া, ঝাঁড়ফুক, তাবিজ-কবজ, মানত ইত্যাদি মানসিক রোগীর ভোগান্তি বাড়ায়।
- পারিবারিক বিশৃঙ্খলা অনেক সময় মাদকাসক্তির কারণ। পারিবারিক শান্তি বজায় রাখুন, সুস্থ থাকুন।
- শিশু-কিশোরদের শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতন মানসিক রোগের অন্যতম কারণ, এসব প্রতিরোধ করুন।
- নারী নির্যাতন মানসিক অসুস্থতার কারণ। নির্যাতন বন্ধ করুন, মানসিকভাবে সুস্থ থাকুন।
- প্রবীণদের মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করুন। পারিবারিক ও সামাজিকভাবে তাদের যত্ন নিন।

মানসিক রোগের চিকিৎসা সুবিধা সম্বলিত প্রতিষ্ঠান (সরকারি পর্যায়)

- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মেন্টাল হেল্‌থ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা ঃ
  শিশু-কিশোর, প্রাপ্তবয়স্ক ও প্রবীণদের পৃথক বিভাগের মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা সাইকোথেরাপি, বিহেভিয়ার থেরাপিসহ বিনোদনমূলক ও অন্যান্য মনোসামাজিক চিকিৎসা সেবা চালু রয়েছে।
  অন্তঃবিভাগ, বহিঃবিভাগসহ ২৪ ঘন্টা জরুরি মানসিক স্বাস্থ্য সেবা বিদ্যমান মানসিক রোগ বিষয়ে স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণ ও কোর্স চালু আছে। মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সহযোগিতা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছে।
- মানসিক হাসপাতাল, পাবনা
- দেশের সকল উপজেলা ও জেলা হাসপাতাল ছাড়াও ৪টি মডেল উপজেলা হাসপাতালে (সোনারগাঁও, কালীগঞ্জ, কেরাণীগঞ্জ ও ধামরাই) বিশেষ চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে
- মনোরোগ বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
- মনোরোগ বিভাগ, সকল সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
- মনোরোগ বিভাগ, সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালসমূহ

মানসিক রোগের চিকিৎসা সুবিধা সম্বলিত প্রতিষ্ঠান (বেসরকারি পর্যায়)

- মনোরোগ বিভাগ, বেসরকারি মেডিকেল কলেজসমূহ
- মাদকাসক্তি ও মানসিক ক্লিনিক
- মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞগণের ব্যক্তিগত চেম্বার